ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা ॥ সংখ্যা ১০৬ ও ১০৭ (যুক্ত), ডিসেম্বর ২০২৫
ISSN : 2411-9059, e-ISSN: 3006-3078 DOI : http://dx.doi.org/10.62296/DVP/10607004

জয়নুল আবেদিন ও কামরুল হাসান-এর ছাপচিত্র চর্চা: একটি তুলনামূলক আলোচনা

নিত্যানন্দ গাইন*

Abstract: Zainul Abedin and Kamrul Hasan are the foremost pioneers in the modern art movement of Bangladesh. The artistic excellence and social commitment of these artists of the forties, are inspiring subsequent generation of Bangladeshi artist. Alongside their main artistic excellence, they also significantly enriched ongoing Bangladeshi printmaking tradition with their distinctive artistic language. But it seems to have always remained somewhat unsaid. However, their printed images are not only aesthetically pleasing; rather, deep engagement with the socio-political and cultural context of Bangladesh are also important. In that sense, the aim and objective of this research is to evaluate the artistic language of these two artists in the context of Bangladeshi printmaking practice. By exploring the visual characteristics, technical method and thematic concerns of the artworks, the study seeks to evaluate their contribution to the printmaking movements in Bangladesh and to identify the similarities and differences in their content and artistic expression.

মুখ্যশব্দ: জয়নুল, কামরুল, ছাপচিত্র, কাঠখোদাই, দুর্ভিক্ষ

১. ভূমিকা

বাংলাদেশের আধুনিক শিল্পচর্চার ইতিহাসে ছাপচিত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পমাধ্যম হিসেবে আজ সুপ্রতিষ্ঠিত। গত শতকের মাঝামাঝি সময়ে একদল স্বপ্নভুক তরুণ শিল্পীর হাত ধরে এ দেশে ছাপাই মাধ্যমের চর্চার সূত্রপাত ও বিকাশ। তাঁদের মধ্যে জয়নুল আবেদিন ও কামরুল হাসানের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কেবল প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষার ভিত্তি স্থাপনেই নয়, বরং ছাপচিত্রের নন্দনতত্ত্ব ও শিল্পভাষা গঠনেও তাঁদের ভূমিকা অনন্য। ছাপচিত্র এমন একটি শিল্পমাধ্যম, যেখানে রেখা, আকার, রং, ছায়া-আলো, বিন্যাস ও বুনট সমস্ত উপাদান একত্রে মিলে শিল্পীর ভাবনা ও অনুভূতিকে দৃশ্যমান আকার দেয়। এই 'শিল্পভাষা' কেবল নান্দনিক

* অধ্যাপক, চারুকলা ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

সৌন্দর্য নয়, বরং সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের প্রতিফলনও বহন করে। জয়নুল আবেদিনের মানবিক বেদনা ও সংগ্রামের চিত্রায়ণ এবং কামরুল হাসানের লোকজ-ধারা ও রাজনৈতিক প্রতিবাদের শৈল্পিক রূপান্তর বাংলাদেশের ছাপচিত্রে এক গভীর ও স্বতন্ত্র পরিচয় নির্মাণ করেছে।

২. গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণাকর্মটি সম্পাদনের ক্ষেত্রে গবেষণার গুণগত পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রাথমিক ও দ্বৈতীয়িক উপাত্তের উপর নির্ভর করা হয়েছে। প্রাথমিক তথ্য হিসেবে, মূল শিল্পকর্ম সরাসরি পর্যবেক্ষণ, প্রদর্শনীর ক্যাটালগ পর্যবেক্ষণ, সংবাদপত্রে প্রকাশিত নিবন্ধ, সমকালীন শিল্প-সমালোচক ও গবেষকগণের মতামত এবং গৌণ বা দ্বৈতীয়িক তথ্য হিসেবে প্রাসঙ্গিক বই, প্রবন্ধ ও অনলাইন ডাটাবেস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সবশেষে, নির্বাচিত ছাপচিত্রের দৃশ্যজ বিশ্লেষণ, তুলনামূলক বিশ্লেষণ ও প্রেক্ষাপটভিত্তিক মূল্যায়ন-এর মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

৩. গবেষণার সীমাবদ্ধতা

এই গবেষণাকর্মটি সম্পাদনের জন্য জয়নুল আবেদিন এবং কামরুল হাসানের শিল্পকর্মসমূহের মধ্যে শুধু ছাপচিত্র মাধ্যমের কাজ বিশ্লেষণ করা হয়েছে, অন্য মাধ্যমের শিল্পকর্ম এতে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। তাছাড়া, সীমিত সংখ্যক শিল্পকর্ম বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আবার, কিছু নমুনা সরাসরি দেখা সম্ভব হয়নি, সেসব ক্ষেত্রে বইপত্র অথবা ক্যাটালগে মুদ্রিত প্রতিলিপি দেখে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়েছে, যা এই গবেষণাকর্মটির অনিচ্ছাকৃত সীমাবদ্ধতা বলে বিবেচিত হতে পারে।

৪. ছাপচিত্রের শিল্পভাষা: ধারণা ও বৈশিষ্ট্য

শিল্পভাষা হলো এমন একটি মাধ্যম, যেখানে রেখা, রং, আকার, বিন্যাস, আলো-ছায়া, বুনট এবং প্রতীকী উপাদানের মাধ্যমে শিল্পী তাঁর অনুভূতি ও বার্তা দর্শকের কাছে পৌঁছে দেন। সাহিত্য যেমন শব্দের মাধ্যমে ভাষা গড়ে তোলে, তেমনি শিল্পভাষা গড়ে ওঠে উপর্যুক্ত দৃশ্যজ উপাদানগুলোর সম্মিলনে। দৃশ্যশিল্পের অন্যান্য মাধ্যমের মতো উপরিউক্ত উপাদানগুলো ছাপচিত্র শিল্পভাষারও প্রধান উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এসব উপাদান চিত্রে শুধু বিষয়ের সরল উপস্থাপন ঘটিয়ে দৃশ্যজ অনুভূতি ঘটায় এমন নয়; বরং চিত্রে গভীরতা ও গতিময়তা, স্পর্শকাতর অনুভূতি তৈরি, উপাদানের ভারসাম্য বিধান, নাটকীয়তা বিধান, এমনকি বক্তব্য প্রকাশে প্রতীকী বয়ানও তৈরি করে। সাংস্কৃতিক পটভূমি, সমকালীন সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, এমনকি শিল্পীর ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গিও শিল্পভাষাকে প্রভাবিত করে।

আর ছাপচিত্র (Printmaking) হলো এমন একটি শিল্প প্রকরণ, যা ছাপের মাধ্যমে নির্মিত হয়। এ প্রক্রিয়ায় প্রথমে একটি নকশা বা ছবিকে কোনো একটি পৃষ্ঠতলে অঙ্কন বা খোদাই করে ছাঁচ নির্মাণ করা হয়। তারপর, ছাঁচের উপরে কালি লেপে কাগজ বা অন্য কোনো পৃষ্ঠতলে ছাপ স্থানান্তর করা হয়। এই সামগ্রিক প্রক্রিয়া শেষে নকশা বা ছবির যে প্রতিলিপি পাওয়া যায় তাকে ছাপচিত্র বলে। এ প্রসঙ্গে বলা যায়–

> A Print is in essence a pictorial image which has been produced by a process which enables it to be multiplied. It therefore requires the previous design and manufacturer of a printing surface. (Griffiths, 1996, p. 9)

ছাপচিত্র হলো কাগজে বা অন্য কোনো তলে ছাপের মাধ্যমে তৈরি করা ছবি, যা সংখ্যায় একাধিক হলেও প্রতিটিতে মৌলিকতা অক্ষুন্ন থাকে। এই শিল্পভাষার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো, কারিগরি উৎকর্ষ ও নান্দনিকতার সমন্বয়। অর্থাৎ, ছাপচিত্র একইসঙ্গে প্রযুক্তিনির্ভর ও সৃজনশীল শিল্প মাধ্যম। এ পদ্ধতিতে একটি ছাঁচ থেকে ছাপের মাধ্যমে বহু প্রতিলিপি তৈরি সম্ভব, যা খুব সহজে ও স্বল্পমূল্যে শিল্পকে গণমানুষের কাছাকাছি নিয়ে যায়। ফলে অর্থ সাশ্রয়ী শিল্পমাধ্যম হিসাবে ছাপচিত্রের সুখ্যাতি বহুদিনের। এ ছাড়াও এর গ্রাফিক ইমপ্যাক্ট (Graphic Impact) দর্শকের মনে তাৎক্ষণিক ও গভীর ভাব সঞ্চার করে। আবার, প্রেক্ষাপটনির্ভরতা অর্থাৎ, সময়, স্থান ও সংস্কৃতির প্রতিফলনও ছাপচিত্র শিল্পভাষায় সার্থকভাবে প্রতিফলিত হয়। ছাপচিত্র তৈরির প্রধান ধাপগুলো হলো নকশা তৈরি, নির্ধারিত মাধ্যমে নকশা স্থানান্তর, কালি প্রয়োগ এবং মুদ্রণ। করণকৌশলগত পার্থক্য অনুযায়ী ছাপ তৈরির বিভিন্ন মাধ্যম রয়েছে। এর মধ্যে কাঠ খোদাই, লিনো খোদাই, এচিং, অ্যাকোয়াটিন্ট, এনগ্রেভিং, লিথোগ্রাফ, সিল্কস্ক্রিন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

৫. বাংলাদেশে ছাপচিত্র চর্চা

উনিশ শতকে কলকাতা কেন্দ্রিক মুদ্রণ সংস্কৃতির প্রভাবে পূর্ব-বাংলা তথা আজকের বাংলাদেশে ছাপচিত্র চর্চার সূচনা ঘটে। কিন্তু তা কখনোই কলকাতা কেন্দ্রের মতো ব্যাপকতা ও মনোযোগ লাভ করতে পারেনি। এ ছাড়াও আমাদের লোক-জীবন ঘনিষ্ট বিভিন্ন অনুষঙ্গ বিশ্লেষণ করেও দেখা যায় যে, মুদ্রণযন্ত্র আগমনের পূর্বেও বিভিন্ন ধরনের লোকজ ছাপ-পদ্ধতির প্রচল ছিল এখানে। তবে এসব ছাপ-পদ্ধতির প্রচল থাকা সত্ত্বেও একথা নিশ্চিত করে বলা যায় যে, বাংলাদেশের আধুনিক ছাপচিত্র চর্চার সূত্রপাত ঘটে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে শিল্পী জয়নুল আবেদিন ও তাঁর সহযোদ্ধাদের দ্বারা ঢাকায় 'গভর্ণমেন্ট আর্ট ইনস্টিটিউট' স্থাপনের মধ্যে দিয়ে। এ প্রতিষ্ঠানই এখানে আধুনিক শিল্পশিক্ষার সূচনা করে এবং প্রাতিষ্ঠানিক ছাপচিত্র চর্চার বাতারণ নির্মাণ করে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই শিল্পী সফিউদ্দিন আহমেদ (১৯২২–২০১২)-কে দায়িত্ব দিয়ে এ শিল্পশিক্ষালয়ের পাঠ্যক্রমে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে ছাপচিত্র অন্তর্ভুক্ত করা হয়। শুরুতে শুধু

রিলিফ পদ্ধতিতে শিল্প-নির্মাণ করা হলেও, সময়ের সাথে সাথে লিথোগ্রাফ, ড্রাই-পয়েন্ট, এচিং ও অ্যাকোয়াটিন্টও শিল্প-নির্মাণের মাধ্যম হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হয়। মুক্তিযুদ্ধত্তোর কালে পরিবর্তিত রাজনৈতিক ও সামাজিক বাস্তবতায় সরকারি-বেসরকারি নানাবিধ পৃষ্ঠপোষকতার সাথে দেশে নতুন নতুন শিল্পশিক্ষালয়-এর দ্বারোদ্ঘাটন; ছাপচিত্র চর্চার ক্ষেত্রকে যেমন প্রসারিত করেছে, তেমন সৃষ্টি করেছে বহু নিবেদিতপ্রাণ ছাপচিত্রী ও ছাপচিত্রানুরাগীও। বস্তুত, প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে সাত দশকের এই যাত্রায় অসংখ্য শিল্পীর নিমগ্ন সাধনা ও সৃষ্টিযজ্ঞ মাধ্যমটিকে এ দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও জনপ্রিয় শিল্পমাধ্যমে পরিণত করেছে। বাংলাদেশের ছাপচিত্রের শিল্পভাষা গড়ে উঠেছে পশ্চিমা করণকৌশলের সাথে লোকজ জীবন-ঐতিহ্য, রাজনৈতিক সংগ্রাম, সামাজিক বাস্তবতা ও প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগের সম্মিলনে। জয়নুল আবেদিন ও কামরুল হাসান এই ধারাকে শুধু ভিত্তি দেননি, বরং এর মাধ্যমে একটি স্বতন্ত্র শিল্পভাষা নির্মাণেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। ছাপাই মাধ্যমে তাঁদের মানবিক বেদনা ও লোকজ অলংকরণধর্মীতার উপস্থাপন এ দেশের ছাপচিত্রকে দিয়েছে স্বতন্ত্র পরিচিতি।

৬. জয়নুল আবেদিনের ছাপচিত্র বিশ্লেষণ

জয়নুল আবেদিন বাংলাদেশের আধুনিক শিল্পান্দোলনের পথিকৃৎদের অন্যতম। বলা যায় কুসংস্কারাচ্ছন্ন, গোঁড়া ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডশূন্য একটি সমাজে তাঁর হাত ধরেই আধুনিক শিল্পযাত্রার সূচনা। তিনি ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের ২৯ ডিসেম্বর তৎকালীন ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার কেন্দুয়াতে (বর্তমান নেত্রকোনা) জন্মগ্রহণ করেন। ছোটোবেলা থেকেই তাঁর শিল্পকলার প্রতি গভীর অনুরাগ ছিল। তিনি কলকাতা গভর্নমেন্ট স্কুল অব আর্টস-এ শিল্পশিক্ষা (১৯৩৮) গ্রহণ করেন।

চিত্র ১: জয়নুল আবেদিন, *বিচিত্রতা*, কাঠখোদাই, ১৯৩৭

চিত্র ২: জয়নুল আবেদিন, *সাঁওতাল মা ও শিশু*, লিনোখোদাই, ১৯৪৫

১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে আঁকা *দুর্ভিক্ষ*-এর চিত্রমালা তাঁকে আন্তর্জাতিক খ্যাতি এনে দেয়। জয়নুল আবেদিন ও তাঁর সহযোদ্ধাদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত পূর্বোক্ত শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দ্বারোদ্ঘাটনের মাধ্যমে শুরু হয় বাংলাদেশের আধুনিক শিল্প-আন্দোলন। সেজন্য জয়নুল আবেদিনকে বাংলাদেশের আধুনিক শিল্পান্দোলন ও প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষার জনক বলা হয়। ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দের ২৮ মে তিনি ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন। জলরং, কালি ও কলম, তেলরংসহ বিভিন্ন মাধ্যমে শিল্পকর্ম রচনা করলেও জয়নুল আবেদিন রেখা, আকার ও আলো-ছায়ার শক্তিশালী প্রয়োগে ছাপচিত্র মাধ্যমেও স্বাতন্ত্র্য অর্জন করেন। চিত্রকলা এবং রেখাচিত্রের ন্যায় তাঁর ছাপচিত্রেও প্রতিফলিত হয়েছে সাধারণ মানুষের সংগ্রামমুখর জীবনচিত্র।

চল্লিশের দশকে করা তাঁর বেশ কিছু ছাপাই ছবিতে দুমকার সাধারণ মানুষের জীবনচিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। কলকাতা আর্ট কলেজের ছাত্র থাকাবস্থা থেকে সাঁওতাল পরগনা দুমকায় যাওয়া-আসা ছিল জয়নুলের। ত্রিশের দশকের মাঝামাঝি থেকেই তাঁর কাজের বিষয়বস্তু হয়েছে দুমকার ভূ-দৃশ্য, শালবন, সাঁওতাল নারী ও পুরুষ কিংবা তাদের জীবনের নানা অনুষঙ্গ। *মহিষের পিঠে বালক* (১৯৪০), *অপেক্ষা* (১৯৪০) এবং *সাঁওতাল মা ও শিশু* (১৯৪০) এ পর্বের কয়েকটি কাজ। আবার ছাত্রাবস্থায় করা একটি কাঠখোদাইয়ের নমুনাও পাওয়া যায়। *বিচিত্রতা* (১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে মাসিক মোহাম্মদীতে প্রকাশিত) শিরোনামের কাজটিতে (চিত্র-১) সারা শরীর সাদা কাপড়ে ঢাকা একটি চরিত্রকে জঙ্গলের মধ্যে গাছের ফাঁকে উপস্থাপন করেছেন শিল্পী। জমাট কালো পশ্চাৎপটের বিপরীতে তীব্র সাদার স্বল্প-রেখায় উৎকীর্ণ পরিবেশ এবং অনির্ণেয় অন্ধকারাচ্ছন্ন মুখাবয়ব একধরনের রহস্যময় আবহ সৃষ্টি করেছে। এচিং মাধ্যমে করা *মহিষের পিঠে বালক* ছবিতে দেখা যায় দীর্ঘ ঘাসের জঙ্গলের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় একটি রাখাল বালক মহিষের পিঠে চড়ে বসেছে। মহিষের হাঁটু পর্যন্ত তলিয়ে আছে ঘাসে। *অপেক্ষা*তে চিত্রপটের সম্মুখভাগে একজন সাঁওতাল নারী, ঘরের দুয়ারের মাটির দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে সামনের পথের দিকে চেয়ে কারো বা কিছুর প্রতীক্ষায় রত। অসমতল ভূ-রেখা পেরিয়ে দূরে দীর্ঘ বনানীর শীর্ষদেশ দৃশ্যমান। নারী চরিত্রের পোশাক-পরিচ্ছদ, অলংকারাদি এবং সাজসজ্জা বিশেষ বৈশিষ্ট্যসূচক। আর লিনোখোদাই মাধ্যমে ছাপা *সাঁওতাল মা ও শিশু*তে কোলের ওপর বসিয়ে শিশুকে দু-হাতে আদর করছেন মা। আরও একটি অনামা লিনোখোদাই ছবিতেও (১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে বসুমতী পত্রিকায় প্রকাশিত) মা ও শিশুর উপস্থিতি দেখা যায় (চিত্র-২)। চারদিকে ঘন অন্ধকারের আপাত বৃত্তের মধ্যে উজ্জ্বল আলোর বিপরীতে ছায়ামূর্তির (silhouette) আকারে উপস্থাপিত মা, তার উলঙ্গ শিশু-সন্তানকে হাত ধরে আলোর উৎসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। শিশুর কাঁধে একটি মাছ ধরার ছিপ এবং মায়ের মাথায় ভারী কিছুর অস্তিত্ব। হাঁটু পর্যন্ত গোটানো মোটা কাপড় পরিহিতা মা, আর কোমরে নিমফুলের ছোটো ছোটো ঝুনঝুনিতে উপস্থাপিত এই শিশু, এ দেশের অগণন সাধারণ শ্রমজীবী মা ও শিশুর প্রতিনিধি যেন। ছবিগুলোর প্রতিটিই বাস্তবধর্মী রীতিতে নির্মিত হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে আলোছায়ার

বাস্তবধর্মী বিন্যাস অনুপস্থিত। মহিষের গলার ঘণ্টা, রাখালের গলার তাবিজ, সাঁওতাল নারীর হাতের হাঁসুলি, খোঁপার ফুল কিংবা মোটা কাপড়ের আঁচলের মতো ছোটো ছোটো উপাদান এ কাজগুলোকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে। প্রায় সব কাজেই মানুষকে গুরুত্বপূর্ণ এবং চিত্রপটের বেশিরভাগ অংশজুড়ে বড়ো করে দেখিয়েছেন শিল্পী। বস্তুত, জয়নুলের ছবিতে বিষয়বস্তু হিসেবে অধিকাংশ সময়ই এসেছে মানুষ। মানব-বর্জিত কিংবা মানুষের সামান্য উপস্থিতিবিশিষ্ট প্রাকৃতিক দৃশ্য যে কিছু আঁকেননি এমন নয়, তবে তার সংখ্যা খুবই অল্প। বেশিরভাগ কাজেই মানুষের বিশালত্বকে মহিমান্বিত করে উপস্থাপন করেছেন তিনি। এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিটি প্রাসঙ্গিক–

> মানুষ ও প্রকৃতির টানাপড়েনে মানুষই তাঁর কাছে বরাবর বড় হয়ে প্রতিভাত হয়েছে। মানুষবিহীন নিস্তরঙ্গ প্রকৃতি তাকে তেমনভাবে আকর্ষণ করেনি। এমনকি নিষ্পিষ্ট পরাজিত মানুষও তাঁর পট জুড়ে একটি শক্তিমান উপস্থিতি হয়ে বিরাজ করে। দুর্ভিক্ষের রেখাচিত্রমালায় যেমন ক্লিষ্ট মানুষগুলো এক মন্যুমেন্টাল অবস্থিতি গ্রহণ করে তেমনই 'মনপুরা' চিত্রের দলিত মৃতদেহগুলো পর্যন্ত যেন পুঞ্জ পুঞ্জভাবে ঊর্ধমুখে ফুঁসে উঠতে চায়। এই পরাভব না-মানা শাশ্বত মানবের ছবি তাঁর মানুষের প্রতি অপরিসীম বিশ্বাস ও ভালোবাসার পরিচায়ক (মনসুর, ২০১৬, পৃ. ৩৮৪)।

তিনি শিল্পে সবসময় চারপাশের সাধারণ মানুষের কথা বলেছেন, তাদের কষ্ট ও সংগ্রামমুখরতার কথা বলেছেন। খেটে খাওয়া এসব মানুষের প্রতি ছিল তাঁর অপরিসীম দরদ। কারণ, খুব সাধারণ একটি পরিবারে জন্মেছিলেন তিনি। একদিকে পারিবারিক আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে আর্ট কলেজে পড়ার স্বপ্ন পূরণ করতে গিয়ে তাঁকে করতে হয়েছে কঠোর সংগ্রাম, অন্যদিকে ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের দুর্ভিক্ষের ভয়াবহ অভিজ্ঞতা– এ দুইই তাঁকে খুব কাছ থেকে দেখতে শিখিয়েছিল জীবনকে। আর জীবনের প্রতি এই দৃষ্টিভঙ্গিই প্রভাবিত করেছিল তাঁর চিত্রপট। সেখানে দেশ, সমাজ ও আপন গোষ্ঠীর প্রতি এবং সর্বোপরি মানুষের প্রতি নিজের দায়বদ্ধতা স্পষ্ট প্রতীয়মান। এই দায়বদ্ধতার প্রকাশ লক্ষ করা যায় তাঁর দুর্ভিক্ষের চিত্রমালায়। চোখের সামনে উন্মূল ক্ষুধার্তের নির্মম মৃত্যু ভীষণ আন্দোলিত করেছিল তরুণ জয়নুলকে। তরুণ হৃদয়ের সেই ক্ষোভ আর আর্তিকে কালো কালির মোটা রেখায় এঁকেছেন নির্নিমেষ। যা আজও মন্বন্তরের ভয়াবহতাকে স্পষ্ট জানিয়ে দেয়। সমকালেও তার আবেদন এতটাই ছিল যে, দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতার আরেক রূপকার নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য কলেজ স্ট্রিটের কমার্শিয়াল মিউজিয়ামে কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে আয়োজিত প্রদর্শনী দেখে বলে উঠেছিলেন–থাকতো জয়নুল আবেদীনের তুলি, লেখনী ছুঁড়ে ফেলে দিতাম (সন্তোষ, ১৯৯৭, পৃ. ৯)।

মূলত রেখাচিত্রের জন্য খ্যাতিলাভ করলেও দুর্ভিক্ষকে ভিত্তি করে ছাপাই ছবিও করেছেন কিছু, যা রেখাচিত্রকে ছাপিয়ে একক বৈশিষ্ট্যে অসাধারণ মর্যাদায় চিহ্নিত হয়নি কখনো (মতলুব,

বা. ১৪০৩, পৃ. ১৫)। এর অধিকাংশই লিনোকাট মাধ্যমে করা হলেও ড্রাই-পয়েন্ট ও লিথোগ্রাফও রয়েছে। ড্রাই-পয়েন্ট চিত্রটিতে ক্ষুধা আর ক্লান্তিতে নতমস্তক এক মানুষকে পটের পুরোটা জুড়ে উপস্থাপন করেছেন। কিন্তু সে মজ্জাগত শক্তিতে লাঠিতে ভর দিয়ে শক্তিহীন কঙ্কালসার শরীরকে সোজা রাখার প্রাণান্তকর চেষ্টায় লিপ্ত, যেন মৃত্যুর কাছে অসহায় আত্মসমর্পণ কোনোভাবেই কাম্য নয় তার। দুর্ভিক্ষের অন্য রেখাচিত্রের মতো সামান্য টোনালভ্যালু যোগ করলেও আলোছায়ার বিন্যাসকে স্পষ্ট করেননি। আবার বিষয়ের সমাবেশ এবং রেখার দৃঢ়তা এতে একধরনের কাঠিন্যও যোগ করেছে। অনেকটা একই রকম বিষয়-বিন্যাস লক্ষ করা যায় সমসাময়িক সময়ে করা লিনোখোদাই চিত্রটিতেও (চিত্র-৩)। এখানেও দুর্ভিক্ষের উপস্থিতি। চারদিকে কালো রঙের প্রবল প্রাধান্যের মাঝখানে একজন নতশির শীর্ণকায় বুভুক্ষুর জান্তব উপস্থিতি পটজুড়ে। চওড়া কালো রেখা আর অনাহারক্লিষ্ট কঙ্কালসার শরীরের সুসংবদ্ধ কাঠামো বিন্যাসে অভিব্যক্তিবাদী সরলতার উপস্থাপন। বস্তুত জয়নুল আবেদিনের করা লিনো এবং কাঠ খোদাইগুলোর অধিকাংশই সাদার চরম বৈপরীত্যের সাথে কালো রঙের প্রবল আধিক্য লক্ষণীয়। ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে করা দুটি লিনোখোদাইতেও (একটি অবশ্য লিনোলিয়াম বোর্ড) বিষয়বস্তু হিসেবে এসেছে দুর্ভিক্ষ। একটিতে ফুটপাতে শায়িত অনাহারক্লিষ্ট মায়ের স্তন্য পান করছে শিশু। অন্যটিও ফুটপাতে শায়িত ক্ষুধাজীর্ণ একটি পরিবারের ছবি। শেষোক্ত ছবিটিতে আলোছায়ার আংশিক বিন্যাস লক্ষণীয়।

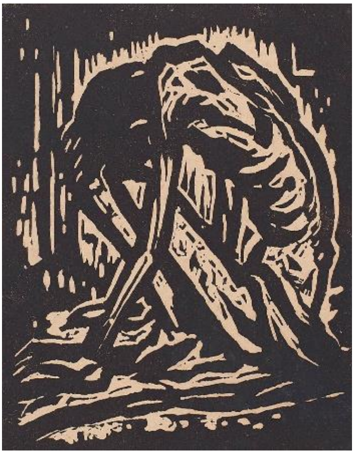

চিত্র ১: জয়নুল আবেদিন, *দুর্ভিক্ষ*, ২১.৫ x ১৭ সেমি., লিনোকাট, ১৯৪০ দশক

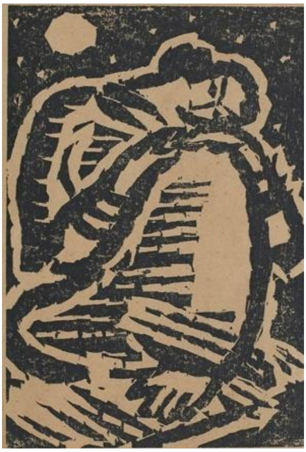

চিত্র ২: জয়নুল আবেদিন, *চন্দ্রালোকে অনুধ্যায়ী* ১৫ x ৯.৫ সেমি., লিনো খোদাই, ১৯৫০ দশক

পঞ্চাশের দশকে এসে চিত্রকলার মতো তাঁর ছাপাই ছবির আঙ্গিকেও আসে পরিবর্তন। এ সময় খানিকটা রোমান্টিক আবহে এঁকেছেন *চন্দ্রালোকে অনুধ্যায়ী*[১] (চিত্র-৪)। পুরো পটজুড়ে একজন রমণীকে হাঁটুতে মুখ রেখে স্মৃতিরোমন্থনরত অবস্থায় দেখানো হয়েছে এতে। তার শিয়রে চাঁদের প্রতীকী উপস্থিতি। আবার ফোঁটা ফোঁটা সাদায় সৃষ্টি করেছেন তারার আলোও। শরীরের তুলনায় নারী অবয়বটির মাথা অপেক্ষাকৃত ছোটো। চোখ-মুখের গড়নও সরল এবং কিছুটা জ্যামিতিক। অনেকটাই যেন আমাদের লোকজ রীতির মাটির পুতুলের আদল। আবার পূর্বের সকল ছবির বিষয়বস্তুর উপস্থাপনভঙ্গি থেকে এর উপস্থাপনভঙ্গিও আলাদা। পঞ্চাশের দশকে তাঁর চিত্রপটে লোকজ আঙ্গিকের যে প্রাধান্য লক্ষ করা যায়, এটা যেন তারই ধারাবাহিকতা। প্রথাগত পরিপ্রেক্ষিতের অনুপস্থিতি এবং বিষয়ের নিবিড় বিন্যাসও লক্ষ করা যায় এতে। তাছাড়া পূর্বের সকল ছাপাই ছবি থেকে এর রেখাও বৈশিষ্ট্যসূচক। পূর্বের মতো বলিষ্ঠ নয়, বরং কিছুটা ভাঙা ভাঙা। যদিও লিনো ছাঁচের উপাদানগত তারতম্যের কারণেও এমনটা ঘটে থাকতে পারে।

বারবার সময়ের সাথে খাপ খাইয়ে নানাভাবে নিজেকে উপস্থাপনের চেষ্টা করলেও তিনি উপলব্ধি করেছিলেন '...সত্যি বলতে কি, এই রীতি আমার জন্য নয়'। তাই আবার কালো কালির মোটা রেখায় থিতু হয়েছেন শেষে। সত্তরের দশকে লিথোগ্রাফ মাধ্যমে দ্রুতলয়ের রেখার সংযোগে নিজের আবেগের প্রকাশ ঘটিয়েছেন সবিশেষ। হালকা হলুদাভ রঙের জমিনে কালো রেখায় এঁকেছেন *মুখ* (১৯৭৫) শীর্ষক লিথোচিত্রটি। চারদিকের মোটা বহিঃরেখার মধ্যে ভীষণ সংক্ষিপ্ত রেখা আর রঙে আঁকা মুখাবয়বটির রেখায় আবার চল্লিশের দশকের সরলতা এবং বলিষ্ঠতা দৃশ্যমান, যা তাঁর নিজস্ব আঙ্গিকও বটে।

ছাত্রাবস্থায় ত্রিশের দশকের শেষ থেকে সত্তরের দশক পর্যন্ত করা জয়নুলের এ সমস্ত ছাপচিত্রের মধ্যে এক অসামান্য শিল্পীর পথপরিক্রমা লক্ষণীয়। বিষয়বস্তু তাঁর চিত্রপটে সরলায়িত ও সাদৃশ্যধর্মী হয়ে ধরা দিলেও ঐতিহ্য, বুদ্ধি আর মানবিকতার সুচারু মেলবন্ধনে তা আমাদের বিস্মিত করে তোলে। অল্প স্পর্শের মাধ্যমে তাঁর ছবি কতটা জাগ্রত ও জীবন্ত হয়ে ওঠে তা-ও এতে উপলব্ধি করা যায় সহজেই। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আরও একটি বিষয় স্পষ্ট হয় যে, কলকাতার সরকারি আর্ট স্কুলের ছাত্র এবং পরবর্তীকালে একই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক হওয়ার পরও তাঁর কাজে আর্ট কলেজে চর্চিত রীতির অনুপস্থিতি। জটিল আলোছায়ার বিন্যাস কিংবা সূক্ষ্ম সরু রেখার পরিবর্তে একধরনের সরলতা-উত্তীর্ণ তাঁর চিত্রতল। ছাপচিত্রের ক্ষেত্রে খানিকটা অভিব্যক্তিবাদী ধারা প্রভাবিত এই সরলতা হয়তো তাঁর রেখাচিত্র থেকে উদ্ভূত হতে পারে, অথবা তৎকালীন সময়ের সমাজবাদী ভাবধারার ব্যাপক উত্থানের পরিপ্রেক্ষিতে সোভিয়েত অলংকরণ বা পোস্টার দ্বারা প্রভাবিত হওয়াটাও অস্বাভিক নয়।

সামগ্রিক বিবেচনায় একথা বলাই যায় যে, শিল্পী জয়নুল আবেদিনের ছাপচিত্র মূলত তৃণমূল মানুষের জীবন ও সংগ্রামের প্রামাণ্য দলিল। ছাপচিত্রের জমিনে শক্তিশালী রেখা, রুদ্র-রুক্ষ বুনট এবং তীব্র আলো-আঁধারির বৈপরীত্যে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর চিত্রভাষা। তাঁর ছাপাই-ছবি যেমন বাস্তবধর্মী, তেমনি প্রতীকী ব্যঞ্জনায় উদ্ভাসিত। তাঁর ছাপাই ছবির নান্দনিক কম্পোজিশন যেমন সামাজিক সত্যকে উপস্থাপন করে, তেমনি তৃণমূল মানুষের আর্তি ও নিদারুণ জীবন সংগ্রামকে চাক্ষুষ করে তোলে সমাজের কাছে। তবে সামগ্রিক বিবেচনায় শিল্পী জয়নুল আবেদিনকে ছাপচিত্র চর্চায় বেশ অনিয়মিতই বলা যায়। মাধ্যমটি একটু সময়সাপেক্ষ হওয়ার কারণে এমনটি হতে পারে, আবার প্রাতিষ্ঠানিক নানা ব্যস্ততাও একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হতে পারে। তবে শুধু ছাপচিত্রই নয়; বরং আর্ট ইনস্টিটিউটকে সময়োপযোগী করে গড়ে তুলতে নিয়ত পরিশ্রম তাঁর সামগ্রিক শিল্পচর্চাকেও ব্যাহত করেছে। তবে ছাপচিত্রের জনবান্ধব চরিত্রের জন্য এ মাধ্যমের বিস্তৃতি এবং চর্চার পরিবেশ নির্বিঘ্ন করতে তিনি সর্বাত্মক নিয়োজিত রেখেছিলেন নিজেকে। শিল্পকে গুটিকয়েক শিল্পরস-নির্বোধ বিত্তবানের বিলাস-সঙ্গী করে না রেখে, বরং দেশের ব্যাপক সাধারণ মানুষের কাছে এর আবেদনকে পরিব্যাপ্ত করে দিতে এবং সমাজের সকল স্তরের শিল্পচেতনাকে উদ্বুদ্ধ করতে লন্ডনে অবস্থানকালেও তিনি ছাপাই মাধ্যমের নানা করণকৌশল আয়ত্ত করেছিলেন (আবদুল্লাহ, ১৯৫২, পৃপৃ. ৪২–৪৩)। তাঁর বিশ্বাস ছিল এচিং, লিথো, কাঠখোদাই প্রভৃতি ছাপাই ছবির প্রকরণসমূহ কাপড়ের পরিবর্তে ধাতুর পাত, পাথর বা কাঠের ওপরে হয় বলে একটি ব্লক থেকে অগণিত সংখ্যায় অনুরূপ ছেপে জনসাধারণের হাতে নামমাত্র মূল্যে তুলে দিতে পারলে এ দেশের শিল্প-আন্দোলনে বৃহত্তর সাধারণ জনগোষ্ঠীকেও যুক্ত করা সম্ভব হবে। না হলে আমাদের মতো নিতান্ত গরিব দেশে সীমিত ক্রয়ক্ষমতাসম্পন্ন জনগোষ্ঠীর হাতে তেলরং, জলরঙের মতো ব্যয়বহুল ছবি ব্যাপকভাবে পৌঁছে দিয়ে শিল্পের সাথে বৃহত্তর জনসম্পৃক্ততা সৃষ্টি সত্যিই অতি দুঃসাধ্য ব্যাপার এবং এতে শিল্পচর্চার প্রকৃত উদ্দেশ্যও ব্যাহত হতে পারে। তাই এ দেশে শিল্পের পথচলায় বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ মাধ্যমের বিস্তৃতি এবং এ দেশে এর চর্চা নিরবচ্ছিন্ন করতে সর্বদা সচেষ্ট রেখেছিলেন নিজেকে।

৭. কামরুল হাসানের ছাপচিত্র বিশ্লেষণ

বাংলাদেশের আধুনিক শিল্পের অন্যতম রূপকার কামরুল হাসান একজন খ্যাতিমান চিত্রশিল্পী, যিনি ‘পটুয়া’ নামে সমধিক পরিচিত। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের ২ ডিসেম্বর তিনি কলকাতার তিলজলা গোরস্থান রোডের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। শিল্পশিক্ষা সম্পন্ন করেন (১৯৪৭) কলকাতা গভর্নমেন্ট স্কুল অব আর্ট থেকে। দেশ ভাগের পর ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে জয়নুল আবেদিন ও অন্যদের সাথে ঢাকায় শিল্পশিক্ষালয় প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দের ২ ফেব্রুয়ারি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন। শিল্পী কামরুল হাসানের শিল্পে লোকজ মোটিফ, অলংকরণধর্মী রেখা, উজ্জ্বল রং এবং সামাজিক-রাজনৈতিক

প্রতিবাদ একসাথে মিশে যায়। ছাপচিত্র মাধ্যমেও তিনি স্বতন্ত্র শিল্পভাষা নির্মাণ করেছেন। বিশেষত সত্তরের দশকে করা ছাপচিত্রগুলো আলাদা করে মনোযোগ দাবি করলেও সাতচল্লিশপূর্ব এবং পঞ্চাশের শেষ নাগাদ করা কয়েকটি শিল্পকর্মও একই প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সত্তরের দশকে করা ছাপছবিগুলো সাতচল্লিশপূর্ব সময়ে করা ছবির ধারাবাহিক উত্তরণের ফসল। এ প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো, তাঁর ছাপাই ছবির হাতেখড়ি হয় কলকাতা আর্ট কলেজের ছাত্র থাকা অবস্থায়। সে সময় ফাইন আর্টের ছাত্রদের কাঠ খোদাইও করতে হতো (শোভন, বা. ১৪১২, পৃ. ৯৩)। সে সুবাদেই তাঁর জানা হয়ে যায় ছাপাই ছবির করণকৌশল। তবে অ্যাকাডেমির বাইরে বৃহত্তর পরিসরে ছাপচিত্রের সঙ্গে তাঁর সংযোগটা ঘটেছিল তৎকালীন সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে। কামরুল হাসান কলকাতার সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও শিল্পচর্চার প্রবল বিরুদ্ধ পরিবেশে টিকে থাকার জন্য নানা ধরনের ফরমায়েশি কাজের সাথে যুক্ত থাকতে হয়েছে তাঁকে। তাছাড়া চরিত্রগত দিক থেকে প্রাণবন্ত এ শিল্পীর নানা ধরনের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সংগঠনের সাথেও ছিল ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। ফলে ভারত বিভক্তি এবং পূর্ব-পাকিস্তানে অভিবাসী হওয়ার পূর্বে কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় কর্মী হওয়ার সূত্রে, কমিউনিস্ট আন্দোলনের পক্ষে রিলিফ পদ্ধতিতে করেছিলেন কিছু পোস্টার। এর মধ্যে *পলিটিক্যাল প্রিজনার্স* (১৯৪৬), *শান্তিশিবির* (১৯৪৮) এবং *রেলওয়ে ধর্মঘট* (১৯৪৮) উল্লেখযোগ্য। রাজবন্দিদের নিয়ে মোট তিনটি এবং ভারতীয় রেলওয়ে ধর্মঘটের পক্ষে দুটি পোস্টার করার কথা জানা যায় (শোভন, বা. ১৪১২, পৃপৃ. ৮৯–৯৬)। এর মধ্যে একটিতে (চিত্র-৫) দেখা যাচ্ছে চিত্রপটের পুরোটা জুড়ে ক্ষুব্ধ এক শ্রমজীবী দু-হাতে একজন নারীর গুলিবিদ্ধ দেহ নিয়ে প্রতিবাদী ভঙ্গিতে দণ্ডায়মান। মুখে কামড় দিয়ে ধরে আছে তার রুটি-রুজির সম্বল (কমিউনিস্ট প্রতীকও) হাতুড়ি। অভিব্যক্তিতে ক্ষোভ ও প্রতিবাদ মূর্ত হয়ে উঠেছে যুগপৎ। নিচে একজন তরুণের হাতে রক্তাক্ত একখণ্ড কাপড়। পেছনে আন্দোলনরত মানুষের ওপর আগ্নেয়াস্ত্র এবং ছুরি নিয়ে আক্রমণোদ্যত প্রশাসন। দণ্ডায়মান তরুণের ঠিক পেছনে 'মানুষের মত বাঁচতে চাই... ১৪৪ তুলতে... রাজবন্দীদের মুক্তি চাই' লেখা প্লাকার্ডের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে আছে এক তরুণী। লাল ও কালো রঙে কাঠখোদাই মাধ্যমে ছাপা এই পোস্টারে ভারত বিভাগপূর্ব বাংলার বিদ্রোহোন্মত্ততার উত্তাপ কিছুটা হলেও আঁচ করা যায়। কাঠখোদাই মাধ্যমে লাল আর কালো রঙে ছেপেছিলেন রেলওয়ে ধর্মঘটের পোস্টারও। চিত্রপটের সম্মুখে এগারোজন শিশু, নারী এবং পুরুষের মুখ। অবাক হওয়ার মতো কিছু একটা সবার অভিব্যক্তিতে স্পষ্ট। ভিড়ের মধ্যে একজন একটি প্ল্যাকার্ড উঁচিয়ে থাকলেও তাতে কিছু লেখা নেই। পেছনে থেমে থাকা রেলগাড়ি এবং মুষ্টিবদ্ধ হাত ও লাল ঝাণ্ডার উপস্থিতি জানান দিচ্ছে, আন্দোলনের সাথে কমিউনিস্ট সংশ্লিষ্টতার। সাদা-কালোতে ছেপেছিলেন *শান্তিশিবির* শীর্ষক পোস্টার। চিনের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সাফল্য তুলে ধরা হয়েছে এই পোস্টারে। এখানে দেখা যাচ্ছে চিনের লালফৌজ শান্তিশিবির লেখা প্ল্যাকার্ড নিয়ে এগিয়ে আসছে আর ভারতীয় শ্রমিক তাদের অভ্যর্থনা

জানাচ্ছে। তার বাঁ-হাতে হাতুড়ি এবং এক পায়ের নিচে কংগ্রেস ও অন্য পায়ের নিচে ব্রিটিশ সরকার। পাশে বসে ডানা ঝাপটাচ্ছে মার্কিন শকুন (শোভন, বা. ১৪১২, পৃ. ৯৬)।

চিত্র ৩: কামরুল হাসান, *পলিটিক্যাল প্রিজনার্স*, কাঠ খোদাই, ১৯৪৬

এই শিল্পকর্মগুলোর বিষয়বস্তু ভারতীয় রাজনীতি ঘনিষ্ঠ হলেও এর বিশেষ লক্ষণীয় দিক হলো কলকাতা আর্ট কলেজের ছাত্র থাকা অবস্থায়ই প্রতিষ্ঠানের অ্যাকাডেমিক রীতির বাইরে গিয়ে তিনি এগুলো রচনা করেছিলেন। যার প্রভাব তাঁর পরবর্তীকালে করা ছাপাই ছবিতেও দৃশ্যমান। তখন আর্ট কলেজের ছাপছবির ধারাটি ছিল থমাস বেউইক চর্চিত রীতিপন্থী, অর্থাৎ সুন্দর ও সূক্ষ্ম সাদা রেখায় বিষয়ের সাদৃশ্যধর্মী উপস্থাপন-নির্ভর। কিন্তু কামরুল হাসান তাঁর রচনায় যে শৈলী ব্যবহার করেছেন, তা অভিব্যক্তিবাদী। বলিষ্ঠ ড্রইংয়ের সাথে সাদা-কালোর চরম বৈপরীত্যে নির্মিত এসমস্ত কাজ। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অবয়ব বা উপাদানের রেখায় আয়তনের অবভাস থাকলেও আলোছায়ার সুস্পষ্ট বিন্যাস অনুপস্থিত। এ শিল্পকৃতিসমূহে আকারের বলিষ্ঠতা ও সরলতার সাথে সুষম পরিসর-বিন্যাস একে অভিব্যক্তিবাদী সরলতায় উত্তীর্ণ করেছে। তবে ছাত্র হওয়ার পরেও আর্ট কলেজের প্রচলিত রীতিপন্থী না হয়ে বরং অভিব্যক্তিবাদী হওয়ার পেছনে তাঁর কমিউনিস্ট-ঘনিষ্ঠতা একটা গুরুত্বপূর্ণ অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বিশ্বে সমাজবাদী ভাবধারা উত্থানের প্রেক্ষিতে ভারতীয় বুদ্ধিজীবী ও প্রগতিশীল ছাত্রমহলে তা ব্যাপক বিস্তার লাভ করেছিল। এদের অধিকাংশই তখন সোভিয়েতপন্থী সমাজবাদী হয়ে উঠেছিলেন। তাদের কাছে এ ভাবধারায় লিখিত বিভিন্ন বইপত্রের চাহিদাও ছিল ব্যাপক। সোভিয়েত রাশিয়া থেকে আসা এসব বই ও পোস্টারের চিত্রায়ণ সাদা-কালোর বৈপরীত্যে অভিব্যক্তিবাদী ধারায় নির্মাণ করা হতো। কামরুল হাসান এসব পোস্টার ও চিত্রায়ণ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। সমসাময়িক কমিউনিস্টপন্থি অনেক শিল্পীর উপরেও প্রভাব পড়েছিল এর। কেউ কেউ আবার সোভিয়েত পোস্টার ছাড়া চায়নিজ পেপার কাটিংয়ের সূক্ষ্মতার দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছিলেন। কিন্তু কামরুল হাসান ছিলেন অভিব্যক্তিবাদী সরলতা এবং বলিষ্ঠতাপন্থি (শোভন, বা. ১৪১২, পৃপৃ. ৯৪–৯৬)। এই সরলতা ও বলিষ্ঠতার ছাপ বজায় ছিল পরবর্তীকালে করা *মাছধরা* (১৯৫০) শীর্ষক তেলচিত্রে। অনেকটা জ্যামিতিক আধুনিকতার সাথে খানিকটা লোক-আঙ্গিকতাও যেন স্পষ্ট এতে। এর সার্থক ক্রম-পরিণতি লক্ষ করা যায় তাঁর *বসে থাকা রমণী* (১৯৫২) শীর্ষক লিথোচিত্রটিতে (চিত্র-৬)। কলম হাতে কোনো কিছু লেখায় রত নারী চরিত্রটি বলিষ্ঠ কালো চওড়া রেখায় নির্মিত। চিত্রপটের একেবারে সম্মুখে প্রায় পুরোটা জুড়ে তার উপস্থিতি। গৃহাভ্যন্তর পেরিয়ে পেছনের বাড়ির ছাদে একটি মোরগ দৃশ্যমান। প্রতিটি বিষয়ের উপস্থাপনে জ্যামিতিকতার সাথে লোকজ সরলতাও উপস্থিত, যা যামিনী রায়ের কথাই মনে করিয়ে দেয়, কিংবা একইসঙ্গে কালীঘাটের পটচিত্রকেও। একই আঙ্গিক লক্ষণীয় তাঁর *স্নানশেষে* (১৯৫৮) শীর্ষক লিথোচিত্রটিতে। এখানে একজন নারীকে স্নান পরবর্তী চুল মোছার ভঙ্গিতে উপস্থাপনের মাধ্যমে অনাবৃত নারী-সৌন্দর্য বিধৃত করেছেন শিল্পী। মহিলার শরীর ত্রিভুজের ভঙ্গিতে নোয়ানো, উন্মুক্ত বক্ষ, মুখের আদলে আধাবিমূর্ত সহজীকরণ (নজরুল, ১৯৯৬, [প্রাপ্ত নমুনায় পৃ. নং উল্লেখ নেই])। পূর্বের মতো চিত্রতল নির্মাণ করেছেন অত্যন্ত পুরু তুলির টানে, সাদা ও কালোর বৈপরীত্যে। কালোর প্রবল প্রাধান্য লক্ষ করা যায় পুরো কম্পোজিশনে। ছবিটির রেখা মোটা ও কালো এবং বিষয়ের বিন্যাস বেশ সরল ও খানিকটা জ্যামিতিক হলেও ভবিষ্যতের আধুনিক ও লোকজ শিল্পের রীতিসমন্বিত কামরুলের উন্মেষও যেন উঁকি দিচ্ছিল নারীর নাকে, চোখে আর দেহভঙ্গিতে।

চিত্র ৪: কামরুল হাসান, *বসে থাকা রমণী*, লিথোগ্রাফ, ১৯৫২

ভারত বিভক্তিত্তোর সময়ে পূর্ব-পাকিস্তানে স্থায়ী আবাস গড়ার পর তাঁর শিল্পের বিষয়বস্তুতে গুঞ্জরিত হয়ে ওঠে তৃণমূল বাংলার নানা অনুষঙ্গ। শুধু বিষয়বস্তুতে নয়, বরং শৈলীতেও বাংলার লোকশিল্পের প্রভাব দৃশ্যমান হতে থাকে এ সময় হতে। বস্তুত পূর্বের কমিউনিস্ট-সংশ্লিষ্টতা তাঁকে টেনে এনেছিল বাংলার তৃণমূল মানুষের কাছে আর গুরুসদয় দত্তের ব্রতচারী আন্দোলন তাঁকে আগ্রহী কওে তুলেছিল তাদের শিল্প ও সংস্কৃতি সম্পর্কে (শোভন, বা. ১৪১২, পৃপৃ. ৮৯–৯০)। তবে বাংলার লোকজ নানা বিষয়ের মধ্যে তাঁকে সবচেয়ে বেশি আলোড়িত করেছিল বাঙালি রমণীকূলের কোমল স্নিগ্ধ সৌন্দর্য। তাঁর সারা জীবনের শিল্পকৃতিতে এর যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে খানিকটা একই ভঙ্গিতে *স্নান* (১৯৬৬) শীর্ষক তৈলচিত্রে প্রতিচ্ছায়াবাদী রীতির অনুসরণ করলেও ছাপছবির বেলায় থেকেছেন অভিব্যক্তিবাদীই। এ ধারায় তাঁর শিল্পকৃতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সৃষ্টি হলো সত্তরের দশকে করা *রায়বেঁশে নৃত্য* (১৯৭৪)। এতে ছবির কেন্দ্রে একজন ঢুলি ঢোল বাজাচ্ছে আর তার সাথে কাঁসর বাজাচ্ছে অন্য একজন। এই দু-জনের চারপাশ ঘিরে নাচছে উদোম গায়ের কৃষককূল। ফলে একধরনের কেন্দ্রাভিমুখী

আবর্তন গতির সৃষ্টি হয়েছে সমগ্র তলজুড়ে। প্রতিটি মানবদেহের আভিব্যক্তিতে নাচের আনন্দের বিচ্ছুরণও ঘটেছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে। এ শিল্পকর্ম সম্পর্কে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও বিশ্লেষণধর্মী মন্তব্য করেছেন প্রখ্যাত শিল্পসমালোচক শোভন সোম। নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো–

> এই "রায়বেঁশে নৃত্যে"র ছবিটিতে শাদাকালোর বণ্টনে যদিও এক্সপ্রেশনিস্টদের অনুরূপ কাঠখোদাইয়ের কথা মনে পড়ে, তবু পাঠক/দর্শক লক্ষ করুন যে, এই ছবির কম্পোজিশন আদৌ ইয়োরোপীয় নয়। এই ছবিতে মাঝখানে, কেন্দ্রে মূল নর্তক মাদল বাজাচ্ছে আর তাকে ঘিরে বলয়ের মতো, হ্যাঁ বলয়ের মতো বৃত্তছন্দে ঘুরে ঘুরে অন্য নর্তকেরা উদ্দাম নাচ নাচছে। লক্ষ করুন এই ছবির পার্সপেক্‌টিভ বা পরিপ্রেক্ষিত আদৌ ইয়োরোপীয় নয় এবং এতে ভ্যানিশিং পয়েন্ট বা বিলয়বিন্দুর ব্যবহার নেই। ছবিটিকে ঘোরান, দেখবেন ছবি ঘুরছে, নর্তকেরা ঘুরে ঘুরে নাচছে, আপনি যেন বিহঙ্গদৃষ্টিতে ঘুরে ঘুরে দৃশ্যটা দেখছেন। লক্ষ করুন, এই ছবিতে ত্রিমাত্রিকতার অধ্যাস নেই। ...এই ছবির কম্পোজিশন বা বিন্যাস দ্বিমাত্রিক কাঁথার মতো, আলপনার মতো, মণ্ডলের মতো। কাঁথায়, আলপনায় কেন্দ্রকে ঘিরে চারপাশের নকশার যে বৃত্তাকার আবর্তন লক্ষ করা যায়, সেই বাঙালি-বিন্যাস কামরুল এই লিনোকাটে করেছিলেন। ...কাঁথার কম্পোজিশন বা বিন্যাস, কাঁথার স্ট্রোবোস্‌কোপিক ভিশন বা দৃক্‌ভ্রমি দৃষ্টি, কাঁথার অসাধারণ দ্বিমাত্রিকতা, যা ইয়োরোপের শিল্পীদের ভাবনাতেই আসেনি, তা কামরুল তাঁর এই লিনোকাটে দেখিয়েছেন (শোভন, বা. ১৪১২, পৃ. ৯৯)।

তবে অবয়বের ক্ষেত্রে সাতচল্লিশপূর্ব বলিষ্ঠ কাঠামো-বিন্যাসের পরিবর্তে এখানে লোকজ ধারালগ্নতার আভাস চোখে পড়ে কিছুটা। ছোটো ছোটো রেখার অর্থপূর্ণ ব্যবহার দেখা যায়। কাঠামোর একই রকম বিন্যাসের উপস্থিতি গুনটানার দৃশ্য-সংবলিত একটি কাঠখোদাইতেও। *রূপকল্প* (১৯৭৪) শীর্ষক ছবিটির পুরো পটজুড়ে নদীতীর দিয়ে একজন শ্রমজীবীর গুন টেনে নিয়ে যাওয়ার দৃশ্য উপস্থাপিত হয়েছে। ভাঙা ভাঙা রেখায় নির্মিত হয়েছে পাশের নদীর রুপালি জলের ঝিলিক।

ষাটের দশক থেকে কামরুল হাসান মোটামুটিভাবে পাশ্চাত্যের সাথে প্রাচ্যের রীতি-বৈশিষ্ট্যের সু-সমন্বয়ে নিজস্ব রীতিতে প্রকাশমান হয়ে ওঠেন। একই সময় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পসংস্থায় যোগ দেওয়ার ফলে (১৯৬০) বাড়তে থাকে তাঁর লোকশিল্পের সাথে ঘনিষ্ঠতা। ফলে তাঁর শিল্পে লোককলার প্রভাব আরও দৃঢ় হয়ে ওঠে। যদিও গুরুসদয় দত্তের ব্রতচারী আন্দোলনের সম্পৃক্ততা তাঁকে আগেই চিনিয়েছিল বাংলার লোকসংস্কৃতিকে। তবে ষাটের দশকে সে বন্ধন আরও প্রগাঢ় হয়। এ সময় লোকজধারার প্রকৃতিনির্ভর স্বতঃস্ফূর্ত রেখার সঙ্গে কিউবিক

রীতির বিশুদ্ধ জ্যামিতিক রেখার সম্মিলনে নিজস্ব শৈলী নির্মাণ করেন তিনি (আজিজুল, ২০০৩, পৃ. ৩৪)। চিত্রকলায় ষাটের দশক থেকে এর ব্যবহার শুরু করলেও স্বাধীনতাত্তোর সময়ে ছাপচিত্রেও এর ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। ১৯৭৪–৭৫ খ্রিস্টাব্দে তাঁর প্রায় কাজগুলোই ছিল কাঠখোদাই মাধ্যমে করা। এসব কাজে অনেক ক্ষেত্রে দেশি প্লাইউড ব্যবহার করে তৈরি করেছিলেন বুনটও (মুনতাসীর, ১৯৯০, পৃ. ৮১)। বস্তুত শিল্পী কামরুল হাসান এক পর্ব থেকে অন্য পর্বে পা দিয়েছেন ক্রমাগত পরিশীলনের মাধ্যমে নিজেকে প্রস্তুত করে। *বৃষ* (১৯৭৪), *মহিষ* (১৯৭৪/?), *বাউল* (১৯৭৪), *কৃষ্ণকলি* (১৯৭৪), *মৎস-স্বপ্ন* (১৯৭৪) এ ছাড়া *রূপকল্প-৭৪* (১৯৭৪) শিরোনামের কয়েকটি শিল্পকর্ম এ পর্বের অন্তর্ভুক্ত। জমাটকালো সমতল জমিনে লতিয়ে ওঠা তীক্ষ্ণ সাদা রেখায় এসব ছবির বিষয়কে উপস্থাপন করেছেন। সাদা-কালোর তীব্র দ্বন্দ্ব কিংবা নেগেটিভ ও পজেটিভ স্পেসের সংঘাতে বোধের প্রখর বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন সার্থকভাবেই। *বৃষ* ছবিতে লিনো খোদাই মাধ্যমে গাঢ় কালোর প্রেক্ষাপটে ছন্দায়িত সাদা রেখায় আঁকা বিশ্রামরত দুটি গরু দেখা যাচ্ছে। সামনের গরুটির পিঠে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পরজীবীর সন্ধানে ব্যস্ত একটি ছোটো পাখি। গরু দুটির চারপাশে ঘননিবদ্ধ ছোটো ছোটো রেখায় ঘাসের চমৎকার বুনুনি সমগ্র পরিসরকে দৃষ্টিনন্দন নকশায় উৎকীর্ণ করেছে। এখানে বিষয়ের উপাদানসমূহকে ভিন্ন ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে নির্মাণ করেছেন শিল্পী। দুটি মহিষকে পাখির দৃষ্টিতে উপস্থাপন করেছেন *মহিষ* শীর্ষক ছবিতে। তাদের সরল আকৃতি ও লম্বা শিং বৈশিষ্ট্য নির্দেশক রূপে প্রকাশিত। আর *বাউল* শীর্ষক ছবিতে পটজুড়ে শশ্রুমণ্ডিত এক বাউলের প্রতিকৃতি এবং একটি একতারাকে উপস্থাপন করেছেন। আবার *কৃষ্ণকলি*তে উপস্থাপন করা হয়েছে এক কৃষ্ণবর্ণ তরুণীর প্রতিকৃতি। ঘোমটা মাথায় বাঙালি রমণীর সলজ্জ চাহনির অনিন্দ্যসুন্দর উপস্থাপন লক্ষ করা যায় কালো পটে সাদা রেখায় আঁকা ছবিটিতে। এতে বৈশিষ্ট্যসূচক ছোটো ছোটো রেখায় বিভিন্ন অলংকার, কাপড়ের নকশা ও পশ্চাৎপটের নকশাও নির্দিষ্ট করেছেন। *মৎস-স্বপ্ন*-এ (চিত্র-৭) ডান হাতে ধরা একটি মাছের দিকে লোলুপদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা এক জেলের চরিত্রকে উপস্থাপন করা হয়েছে। মাছটিও তার দিকে তাকিয়ে আছে সকরুণ দৃষ্টিতে। কৃষ্ণবর্ণ জেলের বলিষ্ঠ শারীরিক গঠন দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ রেখায় নিখুঁত ফুটিয়ে তুলেছেন শিল্পী। উল্লিখিত রচনাসমূহে শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গিতে খানিকটা রোমান্টিক স্ফূরণ লক্ষ করা গেলেও *রূপকল্প-৭৪* শীর্ষক ছাপাই ছবিগুলো সমকালীন সমাজ ও রাজনৈতিক বাস্তবতার এক অনবদ্য উপস্থাপন। উদাহরণ হিসাবে নিম্নে এর দু-একটি ছবির বিষয়বস্তু আলোচিত হলো–

চিত্র ৫: কামরুল হাসান, *মৎস-স্বপ্ন*, লিনোখোদাই, ১৯৭৪

রূপকল্প-৭৪ শীর্ষক সিরিজের একটি ছবিতে পুরোটা জুড়ে এক ধূর্ত লোলুপ শিয়ালের উপস্থিতি। শিয়ালের পায়ের নিচে একটি সাপ ফণা উঁচু করে আছে। ফণার ওপরে একটি মা-পাখির পিঠে বসে আছে ক্ষুধায় মুখ হাঁ করে থাকা দুটি পাখির বাচ্চা। শিয়ালের কানে বসে থাকা আরও একটি পাখির পেছন দিয়ে সন্তর্পণে উঠে আসছে একটি হিংস্র কুমির। বাম দিকের নিচের কোনায় একটি শকুন এগিয়ে যাচ্ছে গরুর দিকে। উপরের দিকে হিংস্র বাদুড় ছুটে যাচ্ছে একটি নিরীহ কবুতরের পানে। স্বাধীনতাত্তোর দেশে শান্তি এবং মূল্যবোধকে নির্বাসনে পাঠিয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত, সুযোগসন্ধানী আর ক্ষমতাবানদের দৌরাত্ম্যকে এখানে শিল্পী উপস্থাপন করেছেন প্রতীকী ব্যঞ্জনায়। আবার অন্য আরেকটি ছবিতে (চিত্র-৮) দেখি আনুভূমিক চিত্রতলকে তিনি মাঝ বরাবর ভাগ করেছেন একসারি কচ্ছপের উপস্থাপন দিয়ে। উপরের অংশে কয়েকজন নর-নারীর ঘনিষ্ঠ হওয়ার দৃশ্য। আর নিচের অংশে উপস্থাপন করেছেন কঙ্কালসার এক দঙ্গল বুভুক্ষু মানুষকে। সবার ওপরে চিত্রপটের মাঝ বরাবর অশুভ ইঙ্গিতবাহী একটি পেঁচা উড়ে আসছে। এই ছবিতে ধনীর নৈতিক স্খলন এবং সমকালীন সমাজব্যবস্থায় ধনী-দরিদ্রের অর্থনৈতিক বৈষম্যের চিত্র তুলে ধরেছেন শিল্পী। কামরুল হাসানের অধিকাংশ কাজে নারী শান্ত-সুখী সমাজের প্রতীক হিসেবে রূপায়িত হলেও এখানে নষ্ট অস্থির সময় ও সমাজের শিকার হিসেবে তাকে উপস্থাপন করেছেন। ব্যর্থ, নষ্ট, দুষ্ট এক সময়কে শিল্পী এখানে প্রতিপন্ন করেছেন, যেখানে নারী শুধুই ভোগের বস্তু। শহুরে শিক্ষিত নারী শিয়াল সাপ আর হিংস্র জানোয়ারের আখড়ায় যেন এক অসহায় জীব (নজরুল, ১৯৯৬, [প্রাপ্ত নমুনায় পৃ. নং উল্লেখ নেই])।

এই সিরিজের অধিকাংশ শিল্পকর্মই এমন সমকালীন সামাজিক এবং রাজনৈতিক বাস্তবতার গরমা-গরম উপস্থাপনায় ঋদ্ধ। প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ ও শিল্পসমালোচক মুনতাসীর মামুন *রূপকল্প-৭৪* সম্পর্কে বলেছেন–

> এ সিরিজ আবার প্রমাণ করেছিলো তিনি কতোটা সমাজ সচেতন। স্বাধীনতার পরবর্তী কয়েক বছরের সামাজিক কলুষ তাঁকেও ব্যথিত হতাশ করে তুলেছিলো অনেকের মতো। ...সমাজ জীবনে রাজনীতিবিদ আমলাদের দৌরাত্ম্য নিষ্পেষিত জনগণের হতাশা, দুর্ভিক্ষ কবলিত মাতা শিশু এইসব হলো 'ইমেজ–৭৪-এর' বিষয়বস্তু। এখানে তিনি কর্তাদের মুখ এঁকেছিলেন পেঁচা, শৃগাল, গিরগিটি, সাপের মতো। প্রশাসনিক মন্থরতার প্রতীক হিসেবে এসেছিলো কচ্ছপ। প্রতিটি কাঠখোদাই মনের মধ্যে তুলে ধরে এক ধরনের জ্যান্ত বীভৎস চিত্র যা কামরুল হাসানের পূর্ববর্তী সব রোমান্টিক ছবির বিপরীত (মুনতাসীর, ১৯৯০, পৃ. ৮১)।

চিত্র ৬: কামরুল হাসান, *রূপকল্প-৭৪*, ৫৫ x ২০ সেমি., কাঠখোদাই, ১৯৭৪

পূর্বের ব্যঙ্গচিত্রের প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে বলা যায়, মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ের আগ পর্যন্ত কামরুল হাসানের চিত্রপটে সমকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক বক্তব্য গুরুত্বপূর্ণভাবে সংযোজিত হয়নি। তবে স্বাধীনতাত্তোর দেশে ধনীক শ্রেণির লাগামহীন দুর্নীতিপরায়ণতা, ব্যভিচার-এর মতো সামাজিক নৈরাজ্যের বিপরীতে সাধারণ মানুষের দুঃখ-কষ্ট এবং রাজনৈতিক বিপর্যয়ের সাথে মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধের অবক্ষয়ও তাঁকে পীড়িত করেছিল ভীষণ। ফলে স্বপ্নভঙ্গের হতাশায় তাঁর ছাপছবি হয়ে উঠেছিল সময়ের আর্তচিৎকার। তা পুরোপরি বাঙালি রমণীর লাবণ্য বর্ণনার ঢলঢল ভাববর্জিত; সমাজসচেতন, তীক্ষ্ণ ও ক্ষুরধার। এ সময়ের কামরুল হাসান অনেকটাই পরাবাস্তববাদী। নানা ধরনের রূপক, প্রতীক আর শান্ত কিংবা হিংস্র সব প্রাণীর বিকৃত ও জান্তব উপস্থিতির মাধ্যমে দুঃসময়কে করেছেন উপস্থাপন। সমসাময়িক ও পরবর্তীকালের পুরোটা সময় তাঁর অসংখ্য শিল্পকর্মে বিশেষত রেখাচিত্রেও স্বাধীনতাপূর্ব রোমান্টিক কামরুল হাসানের সাথে

একেবারে বিপরীতে দাঁড়িয়ে সৃষ্টি করেছেন সমকালীন সামাজিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রামাণ্য দলিল।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এ কথা বলা যায় যে, কামরুল হাসানের ছাপচিত্রে লোকজ বিষয় ও শৈলী, অলংকরণধর্মী বিন্যাস এবং রাজনৈতিক প্রতীকের সমন্বয় দেখা যায়। ছাপচিত্রে তাঁর শিল্পভাষা বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক শিকড়কে দৃঢ়ভাবে ধারণ করলেও রাজনৈতিক ও সামাজিক বার্তাকেও সমান গুরুত্ব দেয়। তিনি শিল্পের সকল শাখায় সমান উৎপাদনক্ষম, যদিও ছাপচিত্রের সংখ্যা অন্যান্য মাধ্যমে সৃষ্ট শিল্পকর্মের তুলনায় কিছুটা কম। মাধ্যমের চরিত্র ও করণকৌশলগত বৈশিষ্ট্য হয়তো এর কারণ হতে পারে। তাছাড়া অন্যান্য ব্যস্ততাও তাঁকে ছাপচিত্র থেকে দূরে সরিয়ে রেখে থাকতে পারে। কারণ, শুধু শিল্পচর্চাই নয় কামরুল হাসান এ দেশের প্রত্যেক প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের সাথেও যুক্ত থেকেছেন, কখনো কখনো নেতৃত্বও দিয়েছেন। তিনি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন, শিল্পের কাজ শুধু নান্দনিক সৌন্দর্যের মাধুর্য বর্ণনাই নয়, বরং তা রাজনৈতিক ও সামাজিক নানা অসাম্য, অবিচারের প্রতিবাদী হাতিয়ারও। খানিকটা অনিয়মিত হওয়া সত্ত্বেও তাঁর ছাপাই ছবির ধারা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে সেখানে তিনি যেমন স্বপ্নবিলাসী আবেগ বুনেছেন চিত্রতলে, তেমনি তা আবার বিদ্রোহে ফুঁসেও উঠেছে। একজন আধুনিক শিল্পী হিসেবে সমাজের কাছে যা তাঁর দায়বদ্ধতারও প্রমাণ।

৮. তুলনামূলক আলোচনা

জয়নুল আবেদিন ও কামরুল হাসান বাংলাদেশের শিল্পচর্চার ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দু'টি চরিত্র। তাঁরা একই সময়ে শিল্পচর্চায় সক্রিয় থাকলেও তাঁদের সৃজন-প্রক্রিয়া, শিল্পভাষা ও দৃষ্টিভঙ্গিতে কিছু মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। জয়নুল আবেদিন এবং কামরুল হাসান দু'জনই গ্রামীণ জীবন, সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার ছবি ছাপচিত্রে স্থান দিয়েছেন। সামাজিক বাস্তবতা ও দেশীয় সংস্কৃতির উপাদান তাঁদের শিল্পে বারবার ফিরে এসেছে। কিন্তু জয়নুলের চিত্রপটে মানবিক সংকট, দুঃখ-দুর্দশা ও দুর্ভিক্ষের মতো তীব্র বাস্তবতা যতটা আবেগে প্রকাশিত, কামরুল হাসানের চিত্রপটে ঠিক ততটা নয়। বরং, কামরুল হাসান বেশি মনোযোগ দিয়েছেন লোকজ ঐতিহ্য, উজ্জ্বল রং এবং উৎসবমুখর চিত্রধারায়। এমনকি রাজনৈতিক সংকট ও ব্যঙ্গ তাঁর চিত্রপটে ভীষণ গুরুত্বে প্রকাশিত, পক্ষান্তরে জয়নুল অনেক বেশি রাজনীতি নিরপেক্ষ, মানবিক। জয়নুল আবেদিনের ছাপচিত্রের রেখা দৃঢ়, মোটা এবং সংযত। তাঁর শিল্পভাষা বাস্তবধর্মী ও মানবিক আবেদনময়। কিন্তু কামরুল হাসানের শিল্পভাষা রূপকধর্মী। কিছু ব্যতিক্রম ব্যতীত রেখা বলিষ্ঠ, কিন্তু সরু। লোকশিল্প থেকে অনুপ্রাণিত ফর্ম ও রঙের বিন্যাস তাঁর শিল্পভাষার বৈশিষ্ট্য। তাই বলা যায়, কামরুল হাসানের ভাষা প্রাণবন্ত, উজ্জ্বল ও প্রতীকী; জয়নুল অবেদিনের ভাষা গম্ভীর ও বাস্তবভিত্তিক। কাঠখোদাই, লিনোখোদাই মাধ্যমে দু'জনেই

সবচেয়ে বেশি কাজ করেছেন। তবে জয়নুল আবেদিনের ড্রাই-পয়েন্ট ও এচিং মাধ্যমের কিছু কাজও চোখে পড়ে। অন্যদিকে কামরুল হাসান কিছু লিথোগ্রাফও করেছেন। মাধ্যম ব্যবহারের ক্ষেত্রে জয়নুলকে সাদা-কালোর সুষম বৈপরীত্য নির্মাণে বেশী মনোযোগী মনে হয়, পক্ষান্তরে কামরুল হাসান বেশি নিরীক্ষা করেছেন শৈলী ও অলঙ্করণধর্মীতায়। জয়নুল আবেদিন শিল্পকে মানুষের মুক্তি ও সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসেবে দেখেছেন, আর কামরুল হাসান শিল্পকে সংস্কৃতি-সংরক্ষণ ও জাতীয় পরিচয় প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেছেন। জয়নুলের বাস্তববাদী ধারা পরবর্তী প্রজন্মের শিল্পচর্চায় প্রভাব ফেলেছে। কামরুলের লোকজধর্মী ধারা শিল্পে নিজস্ব সাংস্কৃতিক উপাদান ব্যবহারের প্রবণতা বাড়িয়েছে। তাই বলা যায়, জয়নুল আবেদিনের শিল্প-ভাষা তীব্র মানবিক ও বাস্তববাদী, আর কামরুল হাসানের ভাষা লোকজ নান্দনিকতায় ভরপুর ও রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক চেতনামূলক। আর এই দুই ধারার মিলনেই বাংলাদেশের ছাপচিত্র চর্চা সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যময় হয়েছে।

৯. উপসংহার

বাংলাদেশের ছাপচিত্র চর্চায় জয়নুল আবেদিন ও কামরুল হাসান অনন্য ও যুগান্তকারী ভূমিকা রেখেছেন। তাঁদের শিল্পদর্শন ও শিল্পভাষার মধ্যে যদিও পার্থক্য রয়েছে, তথাপি দু'জনের অবদান সমগ্র দেশের আধুনিক ছাপচিত্রের জাতীয় পরিচয় তৈরিতে মূল্যবান অবদান রেখেছে। জয়নুল আবেদিনের শিল্পভাষা মানবিক বেদনা, সামাজিক বাস্তবতা ও সংগ্রামের দৃঢ় প্রতিফলন; যেখানে শক্তিশালী রেখা, আলো-আঁধারির তীক্ষ্ণ বৈপরীত্য এবং বাস্তববাদী উপস্থাপনা প্রধান। অন্যদিকে, কামরুল হাসানের শিল্পভাষা লোকজ নন্দনশৈলী, রঙের উজ্জ্বলতা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রাণবন্ত উদযাপন, যা রূপক ও অলংকরণধর্মী বিন্যাসে প্রকাশিত। এই বিপ্রতীপ ধারার সমন্বয় বাংলাদেশের ছাপচিত্রকে বহুমাত্রিক ও প্রাণবন্ত করেছে, যা সময়ের সাথে আরও সমৃদ্ধ হয়েছে এবং নতুন প্রজন্মের শিল্পীদের আজও অনুপ্রাণিত করে চলেছে।

অন্ত্য-টীকা

১. ছবিটির বৈশিষ্ট্য থেকে এটি পঞ্চাশের দশকের কোনো-এক সময়ে করা বলে অনুমেয় হলেও Skira এবং Bengal Foundation থেকে প্রকাশিত Rosa Maria Falvo ed. 'Great Masters of Bangladesh Zainul Abedin' বইটির ১৪১ পৃষ্ঠায় এ ছবিটিকে চল্লিশের দশকের বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সে অনুযায়ী জয়নুলের কাজে লোকজ আঙ্গিকের প্রভাব দৃশ্যমান হয় চল্লিশের দশক থেকেই। কিন্তু বিচিত্রায় জয়নুল অবেদিনের সাক্ষাৎকার এবং বিভিন্ন শিল্পতাত্ত্বিকের মতামত অনুযায়ী এ সময়কাল পঞ্চাশের দশক। তা ছাড়া *আয়না নিয়ে বধূ* (১৯৫৩) এবং *অনুধ্যায়ী* (১৯৫৩) শীর্ষক কাজ দুটির সাথে এর বিষয়বস্তুর খানিকটা মিলও রয়েছে। সেক্ষেত্রে কাজটিকে পঞ্চাশের দশকের বলে ধরে নেওয়াই সমীচীন। বিশিষ্ট

শিল্পসমালোচক আবুল মনসুরও এটিকে পঞ্চাশের দশকে সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাব্যতার কথা উল্লেখ করেছেন (২০-০৭-২০১৬ খ্রি. তারিখে গৃহীত সাক্ষাৎকার অনুযায়ী)।

চিত্র ঋণ

প্রফেসর আবুল মনসুর এবং প্রফেসর ড. ফয়েজুল আজিম-এর ব্যক্তিগত সংগ্রহ, স্কিরা ও বেঙ্গল ফাউন্ডেশান থেকে প্রকাশিত 'Great Masters of Bangladesh Zainul Abedin' এবং বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি কর্তৃক প্রকাশিত 'কামরুল হাসান' শীর্ষক গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত।

সহায়কপঞ্জি

আজিজুল হক, সৈয়দ (২০০৩)। *কামরুল হাসানের শিল্প ও শিল্পচেতনা*। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকা।

মনসুর, আবুল (২০১৬)। 'জয়নুল আবেদিনঃ তাঁর শিল্পভুবন'। *শিল্পকথা শিল্পীকথা*। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকা।

আব্দুল্লাহ আল-মুতী। (১৯৫২)। 'শিল্পী জয়নুল আবেদীন'। *মাহে-নও*, ৪র্থ বর্ষ-৫ম সংখ্যা, আগস্ট।

নজরুল ইসলাম (১৯৯৬)।'কামরুল হাসানের চিত্রকলায় নারী'। *সংবাদ*, ৪৫শ বর্ষ-২৫৬ তম সংখ্যা, ১ ফেব্রুয়ারি।

মতলুব আলী (বা. ১৪০৩)। 'ঐতিহ্যের পটভূমিতে আবেদিনের চিত্রশিল্প ঃ জলরঙে তাঁর উৎকর্ষ ও স্বাতন্ত্র্যের দিকসমূহ'। *শিল্পকলা*, ১৮শ বর্ষ-১ম সংখ্যা।

মুনতাসীর মামুন (১৯৯০)। 'কামরুল হাসানের স্মৃতি'। *কামরুল হাসান* [সম্পা. আবুল হাসনাত], থিয়েটার, ঢাকা।

শোভন সোম (বা. ১৪১২)। 'কামরুল হাসানঃ রঙে রূপে রেখায়'। *নিরন্তর*, ষষ্ঠ সংখ্যা, পৌষ।

সন্তোষ গুপ্ত (১৯৯৭)। 'বাংলাদেশের সাহিত্য ও চিত্রকলার পারস্পারিক সম্পর্ক'। *বাংলাদেশের চিত্রশিল্পঃ স্বরূপের সন্ধান*। মুক্তধারা, ঢাকা।

Antony Griffiths (1996). *Prints and Printmaking An introduction to the history and techniques*. British Museum Press, California.